ইতিহাসের ছিন্নপত্র

(ঔপনিবেশিক শাসন থেকে আজাদী আন্দোলন)

কায় কাউস

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

ইতিহাস।

শব্দটা হামেশাই উচ্চারিত হয় মুখে মুখে। ইতিহাস আদতে কী? অতীত ঘটনা ও কার্যাবলির অধ্যয়ন— তাই তো? সেই সংজ্ঞামতে ইতিহাসের পাঠগুলোও এক-একটা ইতিহাস।

অতীতে একটা ঘটনা বারবার ঘটেছে–ইতিহাসের চোখে একটা কাঠের চশমা পরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা। আমরা তো জানি, ইতিহাসবেত্তাগণ ইতিহাসের মাধ্যমে বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গন্ডগোলটা বেধেছে ঠিক এখানেই। স্ব-স্ব চিন্তা-কাঠামোর ইতিহাসবিদরা নিজেদের রঙে রাঙিয়েছেন ইতিহাসকে। যার যত দক্ষতা, ক্ষমতা ও মাধ্যম ছিল, সে তত বেশি ইতিহাসকে দখল করেছে। প্রচলিত একটা নিষ্ঠুর বয়ান আছে–ইতিহাস নাকি বিজয়ীর চোখ দিয়ে দুনিয়াকে দেখায়।

দুনিয়ার সবাই স্রোতের দিকে ছুটতে স্বস্তি পায়। কিছু মানুষ থাকে, স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে হিম্মত দেখায়। ইতিহাসের ধারাবাহিক স্রোতে অনেক সময় সত্যকে লুকিয়ে ফেলার একটা আয়োজন করা হয়, কিন্তু কিছু মানুষ মাটি ফুঁড়ে সে ইতিহাস দুনিয়াবাসীর সামনে হাজির করার কোশেশ করে। কায় কাউস ঠিক তেমনই একজন ইতিহাসবেত্তা।

'ইতিহাসের ছিন্নপত্র' গ্রন্থটি অতীত ইতিহাসেরই পুনর্পাঠ; নতুন ইতিহাসের সৃষ্টিকর্ম নয়। এখানে গ্রন্থকার নিজ থেকে বয়ান তুলে ধরেনি; স্রেফ ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া মণিমুক্তোগুলোকে সংগ্রহ করেছেন পরম যত্নের সঙ্গে। প্রতিটি পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের পরিশ্রম খুঁজে পাবেন।

'ইতিহাসের ছিন্নপত্র' তিন খণ্ডের গ্রন্থ। আপনাদের হাতে প্রথম খণ্ড তুলে দিতে পেরে ভালো লাগছে। সত্যের মুখোমুখি হয়ে ইতিহাসের এই বোঝাপড়া আপনাদের ভাবনার জগৎকে নতুন করে সাজাবে। ইতিহাসের চোখে পরানো কাঠের চশমাটা খুলে সেখানে 'বাস্তব লেন্স' লাগিয়ে দেওয়ার আয়োজনে আপনাকে স্বাগত। ছিন্নভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ পাঠকদের ঠিকানায় পোস্ট করা হলো 'ইতিহাসের ছিন্নপত্র' গ্রন্থিত চিঠির মাধ্যমে।

সম্মানিত লেখক এবং এই গ্রন্থ প্রকাশ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গ্রন্থের কোথাও কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানানোর বিনীত অনুরোধ করছি। ভালো থাকুন সকলে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
৩০ আগস্ট, ২০২০

মুখবন্ধ

"ইতিহাসের ছিন্নপত্র"—সাধারণভাবে অবিভক্ত ভারতের এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত স্বল্পালোচিত কিংবা আপাত দুর্লভ ইতিহাসের পুনর্পাঠ। স্থান-কাল-পাত্রের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কোনো ধারাবাহিক কিংবা পূর্ণাঙ্গ গবেষণা নয়। এ ইতিহাসের সুবিশাল মহীরূহ হতে ঝরে পড়া, ইতস্তত ছড়ানো, কুড়িয়ে পাওয়া কিছু শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি মাত্র।

ইতিহাস বহুমাত্রিক, বহুপাক্ষিক। বিজয়ী আর বিজিত উভয়পক্ষেরই থাকে ঘটনার স্ব স্ব বয়ান। বিজয়ীর ইতিহাস হয়তো ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠা পায় আর বিজিতের ইতিহাস মিশে থাকে কালের ধুলোয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে। কালের ধুলো থেকে ইতিহাসের সেই স্বর্ণরেণু তুলে আনেন ইতিহাসকার। এভাবেই এককালে যা সর্বসম্মত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা পায়, পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকদের নিরলস অনুসন্ধানে তা ভিত্তিহীন গল্প বলেই প্রতিভাত হয়। আমাদের উপমহাদেশের, বিশেষ করে বাংলাদেশের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তা আরও বেশি প্রযোজ্য।

আমি ইতিহাসকার নই। ইতিহাসের একনিষ্ঠ, মুগ্ধ পাঠক মাত্র। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, উপাখ্যান, কাহিনি, তথ্য-উপাত্ত কিংবা বর্ণনার মধ্যে থাকে ইতিহাস রচয়িতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও মনোভাবের প্রতিফলন। এভাবে বহু আপাতবিরোধ, অসংগতি, উদ্দেশ্যমূলক বিকৃতি কিংবা স্মৃতিভ্রংশতার সমূহ সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে পাঠকেরও নিজস্ব এক উপলব্ধির জগৎ তৈরি হয়। তৈরি হয় তার সত্যানুসন্ধিৎসা আর ব্যাপক পরিসরে জানার আগ্রহ। আমি আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে তেমনই কিছু বিপরীত কিংবা বিস্মৃত বয়ান তুলে এনে সেই অনুসন্ধিৎসাকেই জাগানোর প্রয়াস পেয়েছি। ইতিহাসের যে বিষয়গুলি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু স্বল্পালোচিত বা পাদপ্রদীপের অন্ধকারে লুকোনো মনে হয়েছে তাতেই আমি অধিক মনোনিবেশ করেছি। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিটি ভিন্ন-মত সম্পর্কে যত বেশি জানা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা খণ্ডিত ইতিহাসই, পূর্ণাঙ্গ কিছু নয়। আমার প্রচেষ্টাও সে পথেই পরিচালিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের কোথাও আমি নিজস্ব মতামত কিংবা মন্তব্য সংযুক্ত করিনি। যা কিছু উল্লেখ করেছি আদ্যোপান্ত তা সরাসরি তথ্যসূত্রসমেত মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি, তথ্য কিংবা বর্ণনার সন্নিবেশ। একই বিষয়ে একাধিক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মতকেই উপস্থাপন করতে চেয়েছি, গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে নিরপেক্ষ কোনো মত প্রকাশের চেষ্টা ব্যতিরেকেই। আশাকরি আগ্রহী পাঠকগণকে তা আরও গভীর ও ব্যাপক অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করবে।

প্রতিটি লিখিত বইয়ের আড়ালে থাকে কিছু জীবন্ত বই। একটি বই তৈরি হওয়ার পেছনে যারা নীরবে, নিভৃতে, কাছে কিংবা দূর থেকে ছায়ার মতো উপস্থিত থাকেন, অনুপ্রেরণা জোগান, ত্যাগ স্বীকার করেন, পরম মমতা আর ভালোবাসায় জড়িয়ে রাখেন—তারা। আমার এই সুদীর্ঘ যাত্রায় তাদের সবার অপরিশোধ্য ঋণ গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। বইটি

প্রকাশের দুর্বহ দায়িত্ব নেওয়ায় গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই অন্তর্জালের সকল বন্ধু, সুহৃদ, শুভানুধ্যায়ীদের যারা সব সময় পাশে থেকেছেন, সমর্থন আর উৎসাহ জুগিয়েছেন। পরিশেষে বিনীতভাবে দায় ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এই সংকলনে উদ্ধৃত সকল বইয়ের লেখক, প্রকাশক এবং স্বত্বাধীকারীদের প্রতি।

কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সম্পূর্ণ সংকলনকে কিছু কালপর্বে বিভক্ত করে প্রকাশনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে; যার প্রতিটি খণ্ডই হবে স্বতন্ত্র। আশাকরি এতে করে মূল পাঠের রসাস্বাদনে কোনোরূপ বিঘ্ন ঘটবে না। যদি অসাবধানতাবশত কোনো মুদ্রণ প্রমাদ, তথ্যের অসম্পূর্ণতা কিংবা অসংগতি থেকে থাকে তবে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার বিনীত অনুরোধ রইল। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধনের আশা রাখি।

কায় কাউস
১৬ জুন, ২০২০

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
ঔপনিবেশিক শাসনকাল

প্রথম পর্ব
আজাদী আন্দোলন এবং ইংরেজ বর্বরতা ১৩

দ্বিতীয় পর্ব
ঔপনিবেশিক আমলে মুসলিম শিক্ষা ২৪

তৃতীয় পর্ব
কলকাতার বাবুদের ইংরেজি শিক্ষা ৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
পাকিস্তান আন্দোলন : পটভূমি ও প্রেক্ষিত

প্রথম পর্ব
অবিভক্ত ভারতে মুসলিম বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িকতা ৪৯

দ্বিতীয় পর্ব
আজাদীর স্বপ্ন ২৬৫

তৃতীয় পর্ব
আজাদী আন্দোলনের দলিলপত্র ২৮৭

চতুর্থ পর্ব
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সার্বভৌম বাংলা প্রস্তাব ৩৩৬

পঞ্চম পর্ব
স্মৃতিতে সিলেট গণভোট : পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির লড়াই ৩৫৪

ষষ্ঠ পর্ব
র‍্যাডক্লিফের ছুরি : বাউন্ডারি কমিশন ৩৮০

সপ্তম পর্ব
আজাদ ভারত-আজাদ পাকিস্তান ৩৯৪

অষ্টম পর্ব
কায়দে আজম, দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং পাকিস্তান ৩৯৮

নবম পর্ব
বেহাত আজাদী — ভিন্ন বয়ান ৪৪০

প্রথম পর্ব
আজাদী আন্দোলন এবং ইংরেজ বর্বরতা

এক

"...শুন্যপ্রায় শহরে ইংরেজ সৈন্যরা প্রাণভরে লুটপাট করে ফিরতে থাকে। পথিমধ্যে যাকে তারা পেয়েছে সবাইকে তারা হত্যা করেছে। বাদশাহ ও তার পরিবারের সকলকে বন্দি করে শহরের পথে হডসন নামক জনৈক সেনানায়ক বাদশাহর পুত্রগণকে হত্যা করে। বিচারে বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেওয়া হয়। তথায় তিনি ১৮৬২ খৃস্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর বৃটিশ সৈন্যরা দিল্লী বিদ্রোহীদের হাত থেকে উদ্ধার করে। শহর দখল করার পর সৈন্যরা শিশু, যুবা, বৃদ্ধ কাউকেই রেহাই দেয়নি- সামনে যাকে পেয়েছে - সকলকেই হত্যা করেছে। দিল্লীর কমিশনারের স্ত্রী লিখেছেন–'...For several days after the assault every native that could be found was killed by the soldiers, women and children were spared.' কমিশনার সাহেব নিজেই লিখেছেন–'...The troops were completely disorganised and demoralised by the immense amount of plunder which fell into their hands and the quantity of liquar which they managed to discover in the shops of the European merchants of Delhi.'

লর্ড রবার্টস লিখেছেন–'...দিল্লীর প্রাচীরের মধ্যে যারা বাস করছিল, তারা সকলেই এখন ইংরেজ পক্ষের শত্রু; সুতরাং তারা বধ্য বলে পরিগণিত হয়েছিল।' মার্টিন সাহেব লিখেছেন–'...সমস্ত বিদ্রোহীই দিল্লী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আমাদের সৈন্যরা ছাড়া অতি অল্প লোককেই নগরে দেখা যেত। যখন আমাদের সৈন্যরা নগরে প্রবেশ করে তখন যেসব লোককে পাওয়া গিয়েছিল্, তাদের সকলকেই সঙ্গীনের ঘায়ে বধ করা হয়েছিল। কোন কোন ঘরে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছিল। এতেই আপনি বুঝতে পারেন নিহত লোকের সংখ্যা কত বেশি। এরা বিদ্রোহী নয়, নগরের অধিবাসী। এদের মনে মনে আশা ছিল যে, এদের ক্ষমা করা হবে। আমি নিঃসন্দেহে জানাচ্ছি যে এদের এ বিষয়ে হতাশ হতে হয়েছিল।'

জনাব ফজলে হক খয়রাবাদী লিখেছেন–'...রক্ত পিপাসু ইংরেজ সেনা লুণ্ঠন, গণহত্যা এবং নানা অকল্পনীয় নির্যাতনের মাধ্যমে সমগ্র দেশে এক বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করে।'

১৮৫৮ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হিন্দু অধিবাসীদের শহরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। আরও কয়েকমাস পরে মুসলমানরাও শহরে প্রবেশ করার অনুমতি পায়।

...বেনারসের সিপাইদের অভ্যুত্থানের পর জেনারেল নীল নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইংরেজ ও শিখ সৈন্যদের নিয়ে শান্তিবাহিনী গঠন করলেন। এ শান্তিবাহিনীগুলি শান্তি রক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে টহল দিয়ে ফিরত আর যাকে দেখতে পেত তাকে হয় গুলি করতো বা ফাঁসির ব্যবস্থা করতো। কিছুদিনের মধ্যে ইংরেজরা এসব এলাকায় যেসব নারকীয় ঘটনার অবতারণা করে, ইংরেজ ঐতিহাসিকের বর্ণনায় তা পরিস্ফূট হয়ে ওঠে। 'হিস্টরি অব ইন্ডিয়ান মিউটিনি' পুস্তকে কে এন্ড ম্যালেসন লিখেছেন- '...এ একঘেয়েমিকে ভাঙবার জন্য তারা সোজাসুজি না ঝুলিয়ে দেহগুলিকে ভেঙ্গে চুরে বিকৃত করে, কোনটাকে ইংরেজী অঙ্ক চার-এর মত, কোনটাকে বা সাত-এর মত করে নিয়ে তারপর ঝোলাত।'

শুধু ফাঁসিই নয়, গ্রামে গ্রামে তারা আগুন ধরিয়ে দিত। গ্রামের লোক পুড়ে মরত। এ খবর তারা রসিয়ে রসিয়ে বন্ধু বান্ধবদের কাছে লিখে জানাত। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, মৌলভী, স্কুলের ছাত্র, অন্ধ, খোঁড়া সবাই এ অগ্নিকুন্ডে জ্বলে পুড়ে মরত। চলৎশক্তিহীন স্থবির বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আগুন দেখেও এক পা সরতে পারত না, জ্বলন্ত বিছানায় ছটফট করে মরত। কোন লোক যদি অগ্নিবেষ্টনী ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতো তবে তাকে গুলি করে মারা হত। জনৈক ইংরেজ অফিসার এ সম্পর্কে তার ইংরেজ বন্ধুকে লিখেছেন–'...আমরা জনপূর্ণ বড়ো একটি গ্রামে আগুন লাগিয়ে চারিদিক ঘেরাও করে রইলাম। আগুনের মুখ থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য অনেকেই ছুটে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালালাম।'

বিদ্রোহীদের দ্রুত শাস্তি বিধানের জন্য সামরিক আদালত বসান হয়েছিল। বিচারকরা ছোট, বড়ো সমস্ত অপরাধীকেই ফাঁসির হুকুম চালাতেন।

...জনৈক ব্রিটিশ অফিসার তাদের এলাহাবাদের সাফল্য সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে কিছুটা অংশ তুলে দেওয়া হল :

'...আমাদের এবারকার যাত্রা অদ্ভুত রকম উপভোগ্য হয়েছে। আমরা নদীপথে স্টিমারে চলেছি, আর শিখ ও ফুসিলিয়ার বাহিনীর সৈন্যরা হেঁটে শহরের দিকে চলেছে। আমাদের সাথে একটা কামান রয়েছে। ডানে বায়ে দুদিকে কামান দাগাতে দাগাতে আমরা এগিয়ে চলেছি। কিছুদূর যাওয়ার পর স্টিমার আর চললো না। আমরা নেমে হেঁটে চললাম। আমার সাথে ছিল আমার

পুরান দোনালা বন্দুকটা। তাই দিয়ে বেশ কয়েকটা নিগারকে ধরাশায়ী করলাম। প্রতিহিংসায় আমি তখন একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছি।

আমরা যে পথ দিয়ে যাই দুদিকে আগুন লাগিয়ে যাই। অগ্নিশিখা আকাশ স্পর্শ করে আর বাতাসের বেগে হু হু করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতদিনে বিশ্বাস ঘাতক শয়তানগুলোর প্রতিশোধ নেবার দিন এসেছে। আমরা প্রতিদিন এ অভিযানে বের হই, বিক্ষুব্ধ গ্রামগুলিকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেই। আমরা আমাদের প্রতিহিংসা পূরণ করে চলেছি। নেটিভদের বিচারের জন্য যে কমিশন বসান হয়েছে, আমাকে তার নেতা হিসাবে মনোনীত করেছে। এদের সবার আয়ু আমাদের হাতেই ঝুলছে। একথা তুমি স্থিরভাবে জেনে নিও, আমরা কাউকে রেহাই দিই না। পথের দুধারে গ্রাম গুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে, কোথাও জন প্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। যে গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে চলেছি, তার চেয়ে শুন্যতার ছবি আর কল্পনা করা যায় না। পথের দুধারে পচা জলাভূমি, পুড়ে যাওয়া কুড়েগুলির কালো কালো ধ্বংসাবশেষ, তার উপর ছাতা পড়েছে। মানুষের অস্তিত্বের পরিচায়ক এতটুকু শব্দও শোনা যায় না। শব্দের মধ্যে শুধু ব্যাঙের ডাক, শেয়ালের তীক্ষ্ণ চীৎকার আর অদৃশ্য সহস্র সহস্র পতঙ্গের একটানা মৃদু গুঞ্জন। নিম ফুলের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। গাছের ডালে গলিত মৃত দেহগুলি ঝুলছে, শুয়োরগুলো তাই নিয়ে মহোৎসবে মেতে উঠেছে, তারই উৎকট দুর্গন্ধ বাতাসের সাথে ভেসে আসছে। এ সমস্ত মিলে আমাদের মধ্যে যে শুন্যতা, কালিমা ও বেদনার ছবি রচনা করে তুলেছে, আমার মনে হয়, যারা সেদিন সেখানে ছিল জীবনে কোনদিন তারা তা ভুলতে পারবে না।'

...ঝাঁসি দখলের পর ইংরেজ সৈন্যরা এক সপ্তাহ কাল ব্যাপী এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি লুণ্ঠন করে বেড়ায়। মাত্র ৭৫ জন ইংরেজ প্রাণহানীর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা ঝাঁসীর পাঁচ হাজার লোককে নির্মমভাবে হত্যা করে। পরিব্রাজক বিষ্ণু ভট্ট গোডসে এ সময় ঝাঁসীতে অবস্থান করছিলেন। তিনি লিখেছেন–'...সমস্ত শহর প্রেতভূমি ও মহাশ্মশান বলে বোধ হল। জ্বলন্ত বাড়িগুলি থেকে লেলিহান অগ্নি শিখা উর্ধে উঠে রাত্রির আকাশকে ভয়াল করে তুলল। আগুন ও বাতাসের শব্দ ছাপিয়ে আর্ত নরনারীর ক্রন্দনের রোল উঠল। প্রিয়জনের মৃতদেহের পাশে বসে রমণী কাঁদছেন আর তার সামনে বেয়নেট ঠুকে গোরা সিপাই অলংকার খুলে দিতে বলছে। ধনী দরিদ্র সবার শিশু সন্তানই এক সাথে এক মুষ্ঠি অন্ন চেয়ে কাতর কণ্ঠে কেঁদে ফিরছে। কোথাও বালকপুত্রের মৃতদেহ নিয়ে মা শোকে বিহ্বল। কোথাও পিতার দেহের পাশে বসে শিশু সন্তান ছোটো ছোটো হাতে পিতাকে আঘাত করে ডাকছে। হালোয়াইপুরার জ্বলন্ত অট্টালিকার কাঠের বরগাগুলি দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাতাসে উড়ছে ছাই আর গলিত শবদেহের তীব্র দুর্গন্ধ।'

প্রত্যক্ষদর্শী ডাক্তার লো লিখেছেন–'...মৃত্যু ফিরতে লাগল ঘর থেকে ঘরে উল্কাগতিতে। একটি মানুষকেও রেহাই দেওয়া হল না। রাস্তাগুলিতে রক্ত স্রোত বইতে শুরু করলো।'

হিউরোজ নিজেই লিখেছেন–'...প্রাসাদ অধিকৃত হবার পর থেকে বিদ্রোহীরা শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করল। নগর অবরোধের সাফল্য এই একটি কথাতেই বোঝা যায় যে, একজনকেও জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। নগরীর আশে পাশের বন, বাগান, রাস্তা বিদ্রোহীদের শবদেহে পরিপূর্ণ হল। বিদ্রোহী সৈন্যরা সাধারণত: জাতিতে পাঠান ও আফগান।'

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য লিখেছেন–'...ঝাঁসী শহরের রাণীর সমস্ত সৈন্য এবং বহুলাংশে নাগরিকরা নিহত হল। সমস্ত নগরীর পথে কর্দমাক্ত রক্ত জমে রইল। শকুনী উড়তে লাগল সমৃদ্ধ নগরীর আকাশে। হিউরোজের কঠিন নিষেধ ছিল ভারতীয়েরা যেন কোনমতেই যেন তাদের শবদেহের সৎকার করতে না পারে। সাতই এপ্রিলের পর সমস্ত নগরী যখন পুঁতিগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, গলিত শবদেহের লোভে শৃগাল ও শকুনী বিচরণ করতে লাগল তখন হিউরোজ আদেশ দিলেন, এবার শবদেহের সৎকার করা যেতে পারে।'

...৫১ নং বেঙ্গল ইনফ্যান্ট্রি থেকে বারজন সিপাই দলত্যাগ করে পালিয়েছিল। তাদের ধরে এনে প্যারেডের ময়দানে সবার সামনে ফাঁসি দেওয়া হয়। ৫৫ নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের যে এক 'শ পঞ্চাশজন নিকলসন বন্দি করে নিয়ে আসেন তাদের মধ্যে ৪০ জনকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ১০ই জুন তাদেরকে কামানের সামনে বেঁধে রেখে ফায়ার করা হয়।

পলাতক চার 'শ জন সিপাই সোয়াতে কিছুদিন অবস্থান করার পর কাশ্মীরের দিকে যাত্রা করে। কাশ্মীরের রাজা গোলাপ সিং ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্র করে বিদ্রোহীদেরকে ধরিয়ে দেয়। সবাই ক্রমে ক্রমে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়তে লাগল। মিলিটারী আদালতের বিচারে তারা সবাই মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হল। মেজর বেচার উল্লসিত হয়ে লিখেছেন–'...এভাবে ৫৫ নং রেজিমেন্টের শেষ লোকটি পর্যন্ত বন্য পশুর মত আমাদের জালে ধরা পড়ল। এরই মধ্যে দিয়ে আমরা বিদ্রোহী রেজিমেন্টেগুলোর কাছে হিতকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছি। তাদের কাছে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে পেরেছি কি সুদূর প্রসারী আমাদের শক্তি। সীমান্তের ওপারে গিয়েও অব্যাহতি নেই, সেখানে গেলেও আশ্রয় মিলবে না।'

...সিপাইরা প্রাণভয়ে ইরাবতী নদীর দিকে ছুটে চলেছে। পেছনে তাড়া করছেন অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার ফ্রেডারিক কুপার। তার সাথে সত্তর আশি জন সওয়ার। বিদ্রোহী সিপাইরা নদী তীরে এসেই বড়ই মুসকিলে পড়ল। নদীতে নৌকা নেই। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে উজনালা থেকে তহশিলদার সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ করল। এই আক্রমণে কমপক্ষে দেড়শ সিপাই শহীদ হলো। অসহায় সিপাইদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠল ইরাবতীর তীর। সংগে সংগে কুপারও নদী তীরে এসে উপস্থিত হলেন। এর পরের ঘটনা ফ্রেডারিক কুপার তার লিখিত 'ক্রাইসিস ইন দি পাঞ্জাব' পুস্তকে যা লিখেছেন তা হলো :

‘...সিপাইদের মধ্যে অনেকেই নদীতে ডুবে যায়। নদীর মাঝামাঝি ছোটো একটা দ্বীপ ছিল। অনেকে কাঠের টুকরোর উপর ভর করে ভেসে সেই দ্বীপের দিকে যেতে থাকে। এরা সবাই অনাহারে অবসন্ন এবং পথশ্রমে ক্লান্ত। তার উপর হঠাৎ আমরা যখন আক্রমণ করলাম তখন সবাই প্রাণের আশা ছেড়ে দিল। বুনো পাখীগুলি যেমন নদীর মধ্যে সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করে, এরাও সে রকম চেষ্টা করতে লাগল। ওদের ধরে আনবার জন্য দুখানা নৌকা পাঠালাম। বিশ মিনিটের মধ্যে নৌকা দুখানা সে দ্বীপে গিয়ে ভিড়ল। ভয়ে আর নিরাশায় কোন পথ খুঁজে না পেয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ জন সিপাই আবার নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের ধরবার জন্য যে সব সৈন্য গিয়েছিল তারা ওদের মাথার দিকে তাক করে গুলি করতে উদ্যত হলো। আমি যখন তাদের গুলি করতে নিষেধ করলাম, তখন পলাতক সিপাইরা ভাবল ডেপুটি কমিশনার বোধ করি তাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করবেন। এ কথা মনে করে তারা সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করল। হাত বাঁধার সময় তারা বাধা দিল না। তারা মনে করেছিল সামরিক আদালতে তাদের যথারীতি বিচার হবে এবং বিচারের আগে অন্তত একবার তাদের পেট ভরে খেতে দেওয়া হবে।

রাত দুপুরের সময় দুশো বিরাশিজন বন্দি সিপাইকে উজনালার থানায় নিয়ে আসা হলো। পরদিন অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল বলে এদের মেরে ফেলার কাজটা স্থগিত রাখতে হয়।

১লা আগস্ট দিন ধার্য হলো। আমি সিপাইদের বাঁধার জন্য বেশি করে দড়ি সংগ্রহ করে আনতে বলে দিয়েছিলাম। শিখ সৈন্যরা দড়ি নিয়ে এল। প্রতিবারে দশ জনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গুলি করে মারাই স্থির হলো।

প্রতিবারে দশ জন করে দড়ি দিয়ে বাঁধা সিপাইকে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হতে লাগল। শিখ সৈন্যরা গুলি করার জন্য তৈরী হয়েই ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট থানায় বসে সবকিছু তদারক করছিলেন। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সিপাইরা এদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় ম্যাজিস্ট্রেট ও শিখ সৈন্যদের গালি দিতে লাগল। প্রতিবারে দশজন করে সিপাই প্রাণ দিতে লাগল।

দুশো সাইত্রিশ জন সিপাইকে এভাবে মারা হলে একজন কর্মচারী ম্যাজিস্ট্রেটকে এসে জানাল যে, অবশিষ্ট সিপাইরা প্রাচীরের ভিতরকার ছোট্ট ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে না। সংবাদ পেয়ে আমি নিজেই সেখানে গেলাম। ঘরের দুয়ার যখন খোলা হলো তখন দেখা গেল ভয়ে, শ্রান্তিতে, অবসন্নতায়, অতিরিক্ত গরমে এবং আংশিকভাবে শ্বাসরোধের ফলে ঐ ঘরের পয়তাল্লিশ জন সিপাই প্রাণ ত্যাগ করেছে। স্থানীয় মুর্দাফরাসদের নিয়ে লাশ গুলি বের করা হল। থানার কাছে একটা গভীর কুয়া ছিল। নিহত সিপাইদের লাশগুলি উক্ত কুয়ায় ফেলে দেওয়া হল।’

চীফ কমিশনার কুপারের কাজের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান। স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল তাকে প্রশংসা জানালেন। প্রধান বিচারপতি রবার্ট মন্টোগোমারী সাহেব প্রশংসায় উচ্ছসিত হয়ে

উঠেছিলেন। অপর পক্ষে মার্টিন সাহেব প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'এদের ধ্বংস সাধন করা হল কোন আইনে?'

...ঢাকার লালবাগের খন্ডযুদ্ধে যে সব সিপাই বন্দি হয়েছিল, সে সব পলাতক ক্রমে ক্রমে ধরা পড়তে লাগল। বন্দিদের সবাইকে আন্টাঘরের ময়দানে (বর্তমানে বাহাদুর শাহ পার্ক) গাছের ডালে ডালে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়। দিনের পর দিন মৃত দেহগুলি ঝুলতে লাগল। পচে গলে পড়তে লাগল। শকুনেরা মহোৎসবে মেতে গেল।

হৃদয়নাথ মজুমদার 'দি রেমিনিন্সে অব ঢাকা' পুস্তকে লিখেছেন–'...তাদের সব কয়জনকে ফাঁসিতে ঝোলান হল। আন্টাঘরের ময়দানে এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর থেকে ঢাকার লোক এই জায়গাটাকে ভয়ের চোখে দেখতো। বাংলা বাজার, শাঁখারী বাজার, কলতা বাজার এবং চারিদিককার অন্যান্য মহল্লার লোকদের মধ্যে এ নিয়ে নানারকম গল্প প্রচলিত ছিল। রাত্রিবেলা নিহত লোকদের প্রেতাত্মারা নাকি ময়দানে ঘুরে বেড়াত এবং সেখান থেকে নাকি আর্তনাদ ও নানারকম বিকট শব্দ শোনা যেত। বুড়োবুড়িদের কাছে আমরা এই সকল গল্প শুনতাম। সন্ধ্যার পর ভয়ে ওদিকে মাড়াতাম না।"[১]

দুই

"...ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ধ্বংসের একটা যথার্থ দাবী অনুযায়ী ১৮৫৭ সালের বিপ্লব সাধিত হয় গোলযোগের আকারে। এ সম্পর্কে মি: লেকীর উক্তি :

"বিশ্বের কোন বিদ্রোহকে যদি সত্যাশ্রয়ী বলে অভিহিত করা যায়, তাহলে তা ছিল হিন্দুস্তানের হিন্দু মুসলমানদের বিদ্রোহ।"

লর্ড রবার্টস ভারতে ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং এর নামে মি: এনসেব-এর পত্রের শেষ একটি বাক্যের উল্লেখ করেছেন : 'আমার মতে এসব কার্তুজ ব্যবহার করে সিপাহীদের ধর্মীয় অনুভূতিকে অসহনীয় পন্থায় প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।'

কিন্তু এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে, সভ্যতা-ভদ্রতার দাবীদাররা এ বিদ্রোহের সাথে কেমন আচরণ করেছে, কিভাবে তা দমন করেছে, ধর্মীয় উন্মাদের পরিভাষার জন্য সেসব বিচক্ষণ জ্ঞানীদের কর্মপন্থা কি ছিল, যারা জনসেবার নামে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে ইউরোপ থেকে হিন্দুস্তানে এসেছিল।

---

১. আবু জাফর/স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। [লেখক - সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। পৃ. ১৯১-২১৫]